International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 88-93
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক বৈষম্যতা

অনুপম দত্ত
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

A Human being and his innate values are inseparable, as is any object and its reflection. Though it is not always apparent, it indeed exists and gets expressed when it finds the situation appropriate. The main obstructions in the way of its expression are violence and enmity, selfishness, economic crisis, superstition, political corruption, class division and cast distinction.

If we look back through time, we would see that the last two causes come out as the penultimate reason behind this social and humanistic degradation. It might not have been as prominent as we see in Horoppa and Mahenjadaro, yet, at the initial stage of Arian civilization, especially during the Rig-Vedic age, the seed of this distinction had already been sown when people were distinguished according to their merits and quality of activities. This distinction became more rigid during the later period of Atharva-Vedic age, the reflection of which, even in more deteriorated form, we find in the Primary epics and the Puranas. And with the concretization of this distinction, begins the deterioration of human values. The books like "Yajnavalkyasamhita", "Manusamhita", "Arthashastra", "Mricchakatikam", etc. reflected this deterioration.

The question is, despite the sincere attempts from the great persons like Rammohan, Vivekananda to uplift people from such orthodox value-system, have we really been able to come out of its derogatory effect?

Key Words: value system, degradation, class distinction, time, civilization.

মানুষ উন্নতিকামী পশু। আর এই পশুত্ব সত্ত্বার উপর পরিবেশগত আরোপ তার মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ববোধই বটবৃক্ষের এক-একটি কান্ড-মূল স্বরূপ জন্ম দেয় মানবিক মূল্যবোধের বিকাশিত সত্ত্বাকে। এবং মানুষ নিজ অন্তর-সত্ত্বায় নিজেকে বিকশিত করে তোলে। অর্থাৎ অবয়ব অবয়বীর যে রূপ সম্বন্ধ, মানুষের সাথে মানবিক মূল্যবোধেরও সেইরূপ তাদাত্ম সম্বন্ধ। জগতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে মূল্যবোধের প্রকাশ নেই। কারণ, অজ্ঞানের তমসা যে রূপে জ্ঞানকে বা বৈষয়িক সত্ত্বাকে মিথ্যা রূপে প্রতিপাদন ও গ্রাহ্যরূপে উপস্থাপিত করে; এবং জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের বিনাশ সাধিত হয় ঠিক সেই রূপেই মূল্যবোধও সমর্থিত। হয়তো কালের বিপর্যয়ে তা ম্লান হলেও তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। আর এই প্রকাশিত সত্ত্বার অন্তরায় হয়ে উপস্থাপিত হয় হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণী বা জাতি বৈষম্যতা ভিত্তিক সামাজিক বিষয় সমূহ।

কালসলিলে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক সমাজ দর্শনে, বৈষম্যতা, মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অনন্য-প্রধান কারণরূপে, প্রতিভাষিত সত্ত্বায় প্রতীয়মান হয়। এবং যার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে যুগে-যুগে মানুষ ব্যাপিত হয়েছে, মানবতার প্রতিভূ রূপে। মানুষ উপলব্ধি করেছে যে, সামাজিক অবক্ষয়ের ধারায় মূল্যবোধের উপর আধারিত সুষম পরিবেশ রচনার মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে পরব্রহ্মের আলোকে আলোকিত করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। জীবকুলের শ্রেষ্ঠ মানুষ, উত্তম ইন্দ্রিয় মনের অধিকারী। কলুসমুক্ত মনই মানবিক মুল্যবোধের সংগঠন। মানুষের চিত্তসম্পদ এবং সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ পরিবেশ চেতনার দ্বারা ক্রমশঃ সমৃদ্ধশালী হয়েছে। কিন্তু অসংযত লোভ, পরস্পরের প্রতি শ্রেণী বৈষম্যতা ভিত্তিক দৃষ্টি মানবিক

মূল্যবোধের ক্ষয় সাধন করেছে। ঐশ্বরীক দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দর্শনে ভোগ্যবস্তুকে সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়াই যথোচিত। কারণ অধিক দ্রব্য বা বিত্তসঞ্চয়ের বাসনা মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। এই পৃথিবীকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের নিরন্তর কর্ম করা প্রয়োজন, কর্মময় জীবন মানুষকে সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী করে তোলে। ফলে পরিবেশ সুন্দর ও কল্যাণকর হয় এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত হয়। [১]

সভ্যতার ইন্দ্রজালিকা বিস্তার কালে মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বাস করত তখন, অভিপ্রায়, অন্তঃকরন ও মনের শোভন মিলনের দৃষ্ঠান্ত উপস্থাপন করেছিল।[২] কিন্তু তখনও বাঁচার কামনায় গোষ্ঠীভেদকে শত্রু প্রতিপন্ন করে জেহাদ ঘোষনা করেছিল। আর সেইদিন থেকে সামাজিক বৈষম্যতা-বৈষম্যতার রূপ লাভ করেছিল।

সভ্যতার বিস্তারে উন্নতশীল সভ্যতার মর্যদা লাভ করে, সিন্ধু তথা হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রযুক্ত হয় আদিম পশুত্ব ভাবসত্ত্বারূপ সামাজিক শ্রেনী-জাতি-লিঙ্গ বৈষম্যতা। যেখানে দেখা যায় সামাজিক সম্প্রদায় বা শ্রেনী বিভাজন। যেমন, পুরোহিত, বনিক, কারুশিল্পী ও মুচলেকাবদ্ধ মজুর সম্প্রদায় বা নর-কঙ্কালরূপী ক্রীতদাস। এই সামাজিক স্তর বিন্যাস বা শ্রেনী বিভাজনের আস্তিত্ব দেখে বলা যায় যে, হরপ্পা সভ্যতার সময়েই ভ্রূনাকারে পরবর্তী বর্নাশ্রয়ী কাঠামোর অস্তিত্ব দ্যোতিত হয়েছে।

তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতার উষালগ্নে এই রূপ বৈষম্যতা প্রকট রূপ গ্রহন না করলেও ঋগ্বেদের যুগে শ্রেনী ও বর্ণ বা জাতি ভেদের আভাস পরিলক্ষিত হয়। অক্ষ সূত্রে তদানীন্তন সমাজে মানুষের পাশা খেলার প্রবল ইচ্ছা এবং তার ভয়াবহ ফলাফলরূপ অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। এবং এই খেলাকে সামাজিক অন্যায় রূপে গ্রহন করা হয়েছে। যে পাশা খেলে তাকে কেউ ধার দেয়না। সকল প্রিয়জন তাকে পরিত্যাগ করতে চায়। অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তরের সমৃদ্ধশালী মানুষ এবং নিচুস্তরের দীনহীন মানুষের শ্রেনীবিন্যাস সংগঠনের আভাস পাওয়া যায়। ধনী-দরিদ্রের এই ভেদা-ভেদ সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে শ্রেনী বিভাজনের সূত্রপাত ঘটায়। আবার কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সেই উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের উপজাতি সুলভ সমতাভিত্তিক সমাজ থেকে বৈদিক সমাজ ক্রমশ পদমর্যাদার তারতম্য বা ধনবৈষম্য ভিত্তিক সমাজে উত্তরনের সূত্রপাত ঘটায়।[৩]

জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ পৃথক বিষয়; বর্ণভেদ বলতে বোঝায় বিশেষ আদর্শ দৃষ্টিকোন থেকে সমগ্র জনসমাজকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেনীতে বিভাজন। পৃথিবীর সর্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিজীবি শ্রেণী শাসক ও যোদ্ধাশ্রেণী, উৎপাদক ও বনিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবি শ্রেণী এই চার ভাগে জনসাধারনকে বিভাগ করার প্রয়াস সব যুগেই দেখা যায়। এবং প্রাচীন ভারতও এই বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। সমাজকে ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত করার যে চেষ্টা শাস্ত্রকারেরা করেছেন তা নিছকই আদর্শমূলক, যদিও বাস্তব সম্মত নয়। পূর্বে ভারতবর্ষে দুটি জাতি ছিল, আর্য-অনার্য। আর্যরা পরাজিত অনার্যদের দাস ও দস্যু রূপে গ্রহন করেছে এবং বস্তুসত্ত্বার আরোপ পূর্বক অনার্যদের নিজ-সম্পত্তি মনে করে যথেচ্ছা ব্যবহার করেছিলেন। এদের মধ্যে পার্থক্যের মূল ভিত্তি ছিল দেহের বর্ণ ও সামাজিক রীতিনীতি, অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক।[৪]

ঋগ্বেদে মঙ্গলকারক হিসাবে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার এবং দেবতাদের উপাধি রূপে, বিশেষ করে মিত্র, বরুন ও আদিত্যের উপাধি হিসাবে ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।[৫] এছাড়াও রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানোর জন্য ক্ষত্রিয় শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে।[৬] তবে উল্লেখ্য যে বৈশ্য ও শূদ্র শব্দদ্বয়ের উল্লেখ পুরুষসূক্ত ব্যতিত অন্যত্র নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষসূক্তে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যখা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- পুরুষ রুপী এক বিশ্বজাগতিক যাজ্ঞিক সত্ত্বার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে রাজণ্য, উরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে।[৭] যজুর্বেদের রূদ্রাধ্যায়ে নিষাদ হিসাবে আট জাতীর মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ব্রাত, পুঞ্জিষ্ঠ, স্বনিল, এবং মৃগয়ু শিকারজীবী উপজাতি, পক্ষান্তরে তক্ষন, রথকার, কর্মার তাদের উপজাতীয় পর্যায় থেকে সরে এসে বৈদিক সমাজের নিম্নবর্গে পেশাদার জাতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণদের চারটি বিশেষ গুণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৮] তৈত্তিরীয় সংহিতা[৯] এবং অথর্ববেদে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে।[১০] আবার পরিবর্তনশীল যুগে চিন্তনে ক্ষত্রিয়দের উপর শ্রেষ্টত্ব আরোপ এবং কারণ রূপে রাজসূয় যজ্ঞের বিধান বর্ণিত হয়েছে।[১১] তবে সামাজিক অধিকার প্রাপ্তীর ক্ষেত্রে জন্মযোনীগত জাতিত্ব তৎকালীন সময়ে ছিল না। বেদপাঠ বা যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপের অধিকার সকল মানুষের মধ্যেই ছিল।[১২] ছান্দেগ্য উপনিষদ্ থেকে জানতে পারা যায় যে, পৌত্রায়ণ নামক শূদ্র নৃপতি ঋষি রৈক্কের নিকট বেদাধ্যায়ণ করেছিলেন।[১৩] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রথকারদের কিছু যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার অধিকারপ্রদান করা হয়েছে।[১৪] পূর্ব মিমাংসা সূত্রে সৌধস্বন নামক একটি জাতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে, যা শূদ্র নয়, আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও নয়। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী রাজাকে নিষাদের আতিথ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং নিষাদ কর্তৃক রুদ্রের উদ্দেশ্যে ইষ্টি অর্পনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।[১৫] পরস্পর বিরোধীমূলক মতাদর্শের

প্রতিফলন রূপে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় প্রতিপন্ন হয়, যজ্ঞস্থলে নৃত্যরতা দাসী[১৬] এবং সৌজন্যমূলক দাসত্ব গ্রহণের কথা[১৭]। শতপথ ব্রাহ্মণে নারী, শূদ্র ও কুকুরকে সমার্থক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বারণ করা হয়েছে। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদ্-এ গো, অশ্ব, হস্তী সুবর্ণ, স্ত্রী, দাস ও গৃহকে মানুষের মহিমাসূচক এবং দাস ক্রয়যোগ্য বা উপহার হিসাবে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে প্রদত্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৮]

বৈদিক যুগে দাসরা বা ক্রীতদাসরা তার প্রভুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। বেদের বহু স্তোত্র-দান-স্তুতি স্তোত্রগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে যে ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত দান-সামগ্রীর মধ্যে এই দাসরাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর দাসীদের সম্পর্কে যে সমস্ত উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে- আর্য পুরুষরা দাসীদের উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করত, পত্নী হিসাবে নয়। অবশ্য ঋগ্বেদে আর্যদের দ্বারা দাসীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের উল্লেখ আছে। আবার সন্তানহীনা বিধবা, দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের অধিকারিণী ছিলেন; যা নিয়োগ প্রথা নামে প্রচলিত।[১৯] মহাভারতে এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়; যা নারীত্বের যৌন অবমাননার পরিচয় বাহক।

অথর্ব বৈদিকযুগের পরবর্তী সময়ে সামাজিক বৈষম্যতা যখন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সাধন করেছে তখন এই বৈষম্যতা অন্য মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজে উচ্চ ও নিম্ন থেকে নিম্নত্তর শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যতা প্রকট রূপ লাভ করেছে। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যতার ফল স্বরূপ নারীদের চরম শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছে। সর্বপরি গুণ-কর্মগত বিভাগের উপর জন্মযোনীগত ভেদ আরোপিত হওয়ায় সমাজে সঙ্কটময় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছেল। ফলে গুণ ও কর্মের যথাযথ বিকাশ সাধিত হয়নি। এইরূপ সামাজিক পরিস্থিতিকে জয় করার প্রয়াস হয়তো অনেকে গ্রহণ করলেও, সীমিত ব্যক্তির ভাগ্যে উন্নতি অনেকটা ফলপ্রসু রূপ লাভ করে। যেমন- কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভজাত বেদব্যাস, বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি হীনযোনিজাত হয়েও সাধনার দ্বারা জগৎপূজ্য শাস্ত্রকর্তা মহর্ষী হয়েছিলেন। অর্থাৎ যোগ্যতার সম্মান ও অযোগ্যের যোগ্যতা লাভে সহায়তা করাই ধর্মসঙ্গত। শুধু জন্ম দেখে সমাদর করা মূঢ়তার লক্ষণ। যদি কেউ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম করে শুদ্রের ন্যায় আচরণ করে, অথবা সম বিপরীত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব এবং শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে।[২০]

কন্যাবিক্রয়, মদ্যপান, অগম্যাগমন ও ভ্রূণহত্যা পর্যন্ত অরুচিশীল ক্রিয়াকলাপের ফলেও তৎকালীন ব্রাহ্মণরা সমাজ থেকে বিতাড়িত বা পতিত হত না। যে রূপ বর্তমানে রাজনৈতিক বা আর্থিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সমাজের অন্যশ্রেণীর মানুষ, যারা নিরীহ সদাচারসম্পন্ন ধর্ম্মভীরু তাদের প্রতি খুব সহজেই অত্যাচার- উৎপীড়ন চলে। ধন্য বিচার! ধন্য! স্কন্দ পুরাণের কাশী খন্ডে বলা হয়েছে-

গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকুশীলবান্।
প্রৈষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ।।[২১]

আর্ষ মহাকাব্য, প্রাক্-সমাজব্যবস্থাপনা ও তৎকালীন সমাজ অগ্রগতির ধারাকে লিপিবদ্ধ করেছে যুগান্তরের নিরিক্ষনে। সেখানে যেমন একলব্যের গুরুদক্ষিনা প্রদানের কাহিনী অনুসারে শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তৎরূপ জন্মগত জাতি বৈষম্যতা ভিত্তিক মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয় চরমতাও পরিলক্ষিত হয়। এবং সামাজিক বৈষম্যতার শিকার হতে হয় অসংখ্য মানুষকে। যেখানে নারীত্বের অবমাননা ও শ্রেণীগত বৈষম্যতাও সমভাবে বিস্তারশীল। সমাজ অবক্ষয়ের এই ধারাকে পরিবর্তীত করার জন্য রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের জাগরণের প্রয়াসী হয়েছিলেন; জন্মযোনীগতভেদকে অস্বীকার করে গুণ ও কর্মগত অতিপ্রাচীন ভেদ দর্শনের মাধ্যমে। তাই তিনি বলেছিলেন -

"চাতুর্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। ..."[২২]

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল্ ক্রীতদাস প্রথার সমর্থনে একটা আদর্শ ব্যাখ্যা উপস্থিত করে বলেছিলেন - গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাসের শ্রম এবং উচ্চ-নীচ ভেদা-ভেদের মাধ্যমে। মগধ ও মৌর্য্য যুগে ক্রীতদাস প্রথা অনুরূপ প্রাধান্য লাভ না করলেও, ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ বৌদ্ধযুগের পুঁথিতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে ক্রীতদাসদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাজার এবং স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় এই দ্বিপদ প্রাণীর মূল্য নির্ধারিত হত। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন, ইৎসিন-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধমঠের ক্রিয়া কান্ড সম্পাদনের জন্য রাজারা তাদের দান করতেন। তবে তারা বৌদ্ধ সংঘের সদস্য হতে পারতেন না।

চন্ডাশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহনের দ্বারা ধর্মাশোকে পরিণত হয়ে বৌদ্ধ অনুশাসন অনুসারে জীব হিংসা নিষিদ্ধ করেন, এবং সকল শ্রেনীর সকল ধর্মাবলম্বি মানুষের জন্য অধিকার সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অশোকের দ্বারা প্রদত্ত প্রেমের বিজয়-নীতি ও সমভাবী মনষ্কতা মানব ধর্মকে নতুন দিশা প্রদর্শন করেছে। অশ্বঘোষের মতানুসারে বলা যায় যে, ব্রাহ্মনদের শ্রেষ্ঠত্ব দায়ী করার কোন কারন নেই, কারন শূদ্র ব্রাহ্মনের সম পান্ডিত্য লাভ করেছে। সুতরাং ব্রহ্মন ও শূদ্র একই মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ।[২৩]

বৈষম্যতার নিরিক্ষে সমাজকে নিয়ন্ত্রনের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বিভিন্ন নীতির প্রণয়ন করেন, যা কালের গতিতে সতন্ত্রতা লাভ করে যুগের পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

ভারতীয় সমাজ শতধা বিভক্ত, এই জন্যই হিন্দু সমাজে এত অনৈক্য, বিচ্ছিনতা ও বিশৃঙ্খলা। রাজনীতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরনের চেষ্টার ফলে শূদ্র বংশীয় মৌর্য্য ও গুপ্ত সাম্রাজের অভ্যুদয় হলেও তা স্থায়ী হয়নি। ভারতের জাতীয় জীবনে সর্ব বিষয়ে মাৎস্যন্যায় চিরকাল কার্য্যকরী রূপ লাভ করেছে। ব্রাহ্মন্য প্রতিক্রিয়ার কালে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় জীবনে ও সমাজে সাম্যবাদ আনয়ন করতে পারেনি ফলে অন্তর্হিত হয়েছে।

ত্রিপিটকে যেখানে তিন স্তরের ক্রীতদাসের উল্লেখ আছে, কৌটিল্য সেখানে নয় প্রকার ভেদ দর্শন করিয়েছেন। তিনি জীবনব্যাপী ক্রীতদাস, ও অস্থায়ী বা সাময়িক ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু অপরপক্ষে ব্রাহ্মন্য ধর্ম বিরোধী সকল সম্প্রদায়ের প্রতি কৌটিল্য বিরাগ মূলক প্রবৃত্তি উপস্থাপন করেছেন। তাই বলা যেতে পারে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে শাসক কর্তৃপক্ষের মনোভাব দ্যোতিত হয়েছে। তাঁর সমকালীন অন্যান্য নীতিশাস্ত্রকারগনের উক্তিতেও নৈতিকতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ যে সমাজে গুপ্ত হত্যা, বিষ প্রয়োগ বা যে কোন উপায়ে কার্যোদ্ধার প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শাস্ত্রকারেরাও তা করনীয় রূপে নির্দেশ করেন সে সমাজ থেকে নৈতিকতার উচ্চ আদর্শ আশা করা যায় না।[২৪]

অনুরূপভাবে মনু সংহিতাতেও সামাজিক বৈষম্যতা সমমাত্রা বিলিয়ান হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে শাসক ও শোষিত শ্রেণীর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি অবলিলায় ঘোষণা করে-মানবিক মূল্যবোধের কত নিষ্ঠুর অবক্ষয়ও সম্ভবপর। তবে সমাজ সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে যে সকল নীতির আবশ্যিকতা ছিল তা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, অর্থশাস্ত্র, মনু সংহিতাতে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত রূপ লাভ করেছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ধর্ম জনসাধারণকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত হতে আহ্বান করত এবং তাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গীভূত করত। এই জন্যই মহাযান বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, জৈনধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতি বৈদিক প্রভাবমুক্ত ও সমাজ পদ্ধতি বিষয়ে উদার।

মানবিক মূল্যবোধ জাগরণের গতিকে তরান্বিত করার জন্য বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের নীতি শিক্ষা দানের রূপকে পঞ্চতন্ত্র রচনার মাধ্যমে সমাজে জাগরিত করেছিলেন। এবং পশু-পক্ষীর চরিত্রায়নের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের চরিত্রায়নের চেষ্টা করেছিলেন। এবং পরবর্তী কালে রচিত শতকত্রয়েও সেই রূপ চেষ্টার প্রতিফলন দৃষ্ট হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- ভোগবিলাসের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বৈরাগ্যের সাধন এবং অপরপক্ষে অনুরাগ প্রদর্শন। প্রেমের মধুরতা যেমন সত্য তেমন রুক্ষতাও কম সত্য নয়। নিজ মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে উচ্চাকাঙ্খী হয়ে মহত্বের আদর্শ অনুসরনই মানুষের চলার পাথেয়। কারণ কর্ম মানুষের জীবনকে চালিত করে, কর্মের দ্বারাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত, ধর্ম, শ্রেণী বা জাতির দ্বারা নয়।

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বৈষম্যতা পূনরুদ্ধারের জন্য নারায়ণ শর্মা প্রাচীন নৈতিকতা অনুকরণের মাধ্যমে নবরূপ প্রদান করলেন, যা মানবিক মূল্যবোধের উত্তরণমূলক হলেও শিক্ষার অভাবে সমাজ-সংস্কার সম্ভবী রূপ লাভ করল না। কালের গতিতে আগত শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করে ও বসতি স্থাপন পূর্বক ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী হয়ে হিন্দুত্ব লাভ করে, ফলে মানবিক মূল্যবোধের বিভিন্ন ধারা প্রত্যক্ষিত হয়। মূল্যবোধের এই ধারা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন রসদ যোগায়। সামাজিক বৈষম্যতাকে পরাভূত করে মূল্যবোধ গঠনে রাজা রামমোহন - বিবেকানন্দ বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছিলেন।

যারা কুটীরে বাস করে, অর্থাৎ শ্রমজীবী দরিদ্র সম্প্রদায় আজ ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের পায়ের তলায় পিষ্ঠ হতে-হতে তাদের মধ্যে এই ধারনা বিস্তার লাভ করেছে যে, তারা ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হবার জন্যই জন্মলাভ করেছে। বুদ্ধিমানের শক্তি মানসিক; মনের জগৎ আলো-আঁধারির জগৎ। এই প্রহেলিকাময় জগৎ-ব্যাপারে প্রবঞ্চনার বহু সুযোগ থাকে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ অর্থহীন আচার ও সংস্কারের প্রবর্তন ও সংরক্ষনের চেষ্টা করে অবিরত অপরের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন; যে কোন নতুন ভাবের বিরোধীতা করেছেন। যখন জনসাধারনের কৃপার উপর নির্ভরের সময় আগত হয়েছে তখন জনসাধারন যা চেয়েছে, তার পক্ষে ঈশ্বরের নামে বিধান প্রদত্ত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক বৈষম্যতা নিরিখে আদর্শ যুগ-কল্পনায় বলেছেন- "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারন শক্তি এবং শুদ্রের সাম্যের আদর্শ- এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা হবে একটি আদর্শ রাষ্ট্র"।[২৫]

বর্তমানে জাতিপ্রথা প্রকৃত জাতি নয় বরং তা জাতির অগ্রগতির পক্ষে মহা প্রতিবন্ধক, কোন বদ্ধমূল প্রথা, বংশগত জাতি, এবং তাদের সুবিধাভোগের বিশেষ অধিকার। প্রকৃত জাতি পূর্ণবিকাশের পরিপন্থী। এই প্রকৃত জাতির বিকাশকে অবরুদ্ধ করাতেই ভারতের পতন হয়েছে। প্রাণহীন জড় অভিজাত সম্প্রদায় এবং বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী প্রকৃত জাতির প্রচন্ড আঘাততুল্য। আসল জাতি বিকশিত হোক তথা কথিত জন্মগত জাতি-বন্ধন ভেঙে ফেলা হোক, তাহলেই উত্থান সম্ভব হবে। তবে উল্লেখ্য যে, সামাজিক বৈষম্যতাই রাজনৈতিক পতন ও কালের পরিবর্তনের মধ্যে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে স্থায়ীত্ব প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমরা বিধি বহির্ভূত হতে চাই। কারণ অনু-পরমাণু থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত সকল সত্ত্বাই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। এইরূপ চিন্তনের উপরেই সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস রচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন – "খ্রীষ্টানরা যাঁকে খ্রীষ্ট-মানব বলেন, বৌদ্ধরা বলেন বুদ্ধ-মানব, যোগীরা বলেন মুক্তপুরুষ – সেই পূর্ণ মানব এই শৃঙ্খলার একপ্রান্ত- তিনিই সংকুচিত অবস্থায় শৃঙ্খলার অপর প্রান্তে জীবানুরূপে প্রকাশিত"। "যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব, খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তু বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও সংকুচিত বুদ্ধ বলতে হবে"।[২৬]

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভাইরাস থেকে অভিব্যক্তির নানা স্তর পেরিয়ে যুগান্তরে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চৈতন্য এসেছে ক্রম-অভিব্যক্তির নানা পর্যায়ে এবং যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের মাধ্যমে জগতের মধ্যে জীব-বৈচিত্রের সৃষ্টি, পরিবর্তন ও বিনাশও সমভাবে সাধিত হয়েছে। জগতের সকল প্রাণসত্ত্বার মধ্যে যেরূপ শ্রেণী বা জাতিগত বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় মানুষের সেক্ষেত্রে তৎরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান চেতনায় মানুষ বিশ্ব-জগৎ চরাচরের শ্রেষ্ঠ জীব, সুতরাং এইরূপে জীবের কাছে শ্রেষ্ঠত্বই প্রত্যাশিত; কোনরূপ বৈষম্যতা বা ভেদাভেদ নয়। তবুও কালের গতিতে মানুষ নিজেকে হিংস্র পশুত্ব সত্ত্বায় উন্নিত করেছে। আজ একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে উন্নতশীল, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, চিন্তাশীল, জগৎকে কুক্ষিগত করার ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করলেও বাস্তবে তা যথার্থতা লাভ করেনি। সভ্যতার রঙে নিজেকে রাঙালেও প্রকৃত রঙ যেন ফিকে হয়ে গেছে। জন্মলগ্নের শুভ্র, স্বচ্ছ মনের উপর পরিবেশ তার কালো ছায়ার দ্বারা জীবন-পাতাকে দূষিত করেছে। আর এই দূষণ মূল্যবোধহীনতার দূষণ। যার থেকে মুক্তির পথ আমাদের খুঁজতে হবে প্রীতি-প্রেম, ভালোবাসা-সহানুভুতি এবং আদি সৃষ্টি যুগলের দূত আমরা সকলে, তাই সকলেই আমরা মানুষ; এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে।

মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এসো আমাদের সাহায্য করো! তোমাদের সাহায্য করো! কেননা তুমি-আমি সকলেই আজ বিপন্ন! ...

তথ্যসুত্র ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

১. মূল্যবোধ জাগরনে 'ঈশোপনিষদ্'- বলা হয়েছে –
"... তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' ।।১।।
"... কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজিবিষেচ্ছতং সমাঃ .. ।।২।।
২. ঋগ্বেদের সংজ্ঞানসুক্তে (১০/১৯১) মানবিক মূল্যবোধ দ্যোতিত হয়েছে –
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমুস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।৪।।
৩. ঋগ্বেদের অক্ষসূক্ত। ১০/৩৪।
৪. ঋগ্বেদ- ৬/৭৫/১০।
৫. ঋগ্বেদ- ৭/৬৪/২, ৮/২৫/৮, ৮/৬৭/১, ১০/৬৬/৮ ।
৬. ঋগ্বেদ- ৪/৪২/১, ১০/১০৯/৩ ।
৭. ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত- ১০/৯০।
৮. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১১/৫/৭/১।
৯. তৈত্তিরীয় সংহিতা- ১/৭/৩/১।
১০. অথর্ববেদ- ৫/১৭/১৯।
১১. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১৪/৪/১/২৩।
১২. কাটক সংহিতা- ৯/১৬।

১৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ্- ৪/১-২।
১৪. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ- ১/১/৪১।
১৫. সাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ- ২৫/১৫।
১৬. তৈত্তিরীয় সংহিতা- ৭/৫/১০/১।
১৭. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্- ৪/৪/২৩।
১৮. ছান্দোগ্য উপনিষদ্- ৬/২৪/৩।
১৯. ঋগ্বেদ- ১০/১৮/৭, ১০/৪২/২।
২০. "শুদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবে শূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ"।। -মহাভারতের শান্তিপর্ব।
পুরাণে বলা হয়েছে- "চন্ডালোS পি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" -পদ্মপুরাণ।
২১. স্কন্দ পুরাণের কাশী খন্ড- ১/৪০/১১৮।
২২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- ৪/১৩।
২৩. অশ্বঘোষ- "বজ্রচ্ছেদিকা"।
২৪. অর্থশাস্ত্রে সমাজ ব্যবস্থা- নিবন্ধ- ডঃ শান্তি বন্দোপাধ্যায়।
২৫. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ- ৭/৩০১/২।
২৬. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ- ২/২৭, ৫/৩১৩।
২৭. "জন্মের সময় মানুষের মন থাকে সাদা, অলিখিত কাগজের মত" -জন লক।

নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. গোস্বামী বিজনবিহারী, *অথর্ববেদ,* ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা
২. গম্ভীরানন্দ স্বামী, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী,* ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা
৩. ঘোষ জগদীশচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা
৪. দত্ত ভুপেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (দ্বিতীয় খন্ড),* ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, নবভারত প্রকাশনী, কলকাতা
৫. বন্দোপাধ্যায় দীপেন্দ্রনাথ, *প্রতিরোধ প্রতিদিন,* ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, মণীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা
৬. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। *মনুসংহিতা।* ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।
৭. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (তৃতীয় খন্ড)।* ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা
৮. বসু যোগীরাজ, *বেদের পরিচয়,* ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা
৯. বসু সুমিতা, *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,* ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা
১০. ভট্টাচার্য্য নারায়নচন্দ্র, *অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি,* ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা
১১. ভট্টাচার্য্য নরেন্দ্রনাথ, *ভারত-ইতিহাসে বৈদিক যুগ,* ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, বেদ বিদ্যাকেন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
১২. ভট্টাচার্য্য সুকুমার, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য,* ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
১৩. ভৌমিক জাহ্নবীচরণ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা
১৪. রায় সত্যরঞ্জন, *বর্ণাশ্রম ও বৈশ্যজাতি,* ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, সিদ্ধেশ্বর মেসিন্ প্রেস, কলকাতা
১৫. সেন সুকোমল, *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ,* ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
১৬. সেন সুজিত, *জাতপাতের রাজনীতি,* ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা
১৭. সুর অতুল, *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য,* ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা

*****